শিশুশিক্ষায় অবহেলিত দিক

আব্দুল বায়েস

২৪ আগস্ট, ২০২৪
০৮:৫৯

শেয়ার

অ +

অ -

‘ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে’ এই আপ্তবাক্য মনে রেখে শিশুদের সামাজিক ও মানসিক দক্ষতাগুলো বাড়ানো যায় কি না, তা নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন ইউনিভার্সিটি অব সিডনির স্কুল অব ইকোনমিকসের অধ্যাপক শ্যামল চৌধুরী ও তাঁর সহগবেষকরা। তাঁরা মনে করেন, বেশির ভাগ শিক্ষাব্যবস্থায় যে দক্ষতাগুলো শেখানো হয়, তা হচ্ছে অনেকটা সনাতনি সাক্ষরতা ও গণনা সংক্রান্ত (লিটারেসি ও নিউমারেসি)। এগুলো নিঃসন্দেহে শিশুর কগনিটিভ স্কিলের (বোধবোধক দক্ষতা) সঙ্গে সম্পর্কিত। অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে এগুলো শেখানোর পেছনে ইতিহাসটা হচ্ছে এই যে

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সময় ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের সাক্ষরতা ও সংখ্যাসূচক জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা গোনা ও পড়ার দক্ষতা নিয়ে ফ্যাক্টরিতে কাজ শুরু করতে পারে।

অন্তত ওই সময়ে এই দুটি দক্ষতা বিরাট উপকারে এসেছিল এবং অতটুকুই দরকার ছিল বলে মনে হয়।

তবে উল্লিখিত গবেষকদের ধারণা, এর বাইরেও সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা বলে এক ধরনের দক্ষতা রয়েছে এবং বর্তমান দুনিয়ায় এদের গুরুত্ব অপরিসীম। লিটারেসি ও নিউমারেসির মতো সামাজিক ও মানসিক দক্ষতাগুলো শেখাটাও খুব জরুরি। জীবনের অনেক ব্যাপার রয়েছে, যেগুলোর সমাধান নিহিত থাকে এই দক্ষতাগুলো অর্জনের ওপর নির্ভর করে; যথা–চাকরির ক্ষেত্রে তারাই বেশি উপার্জন করে, সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা যাদের বেশি থাকে।

সুতরাং এ ধরনের দক্ষতার একটা প্রায়োগিক মান আছে বিধায় তাঁরা গবেষণায় লিপ্ত হলেন। তাঁদের লক্ষ্য এটি দেখা যে প্রথমত, এই সামাজিক ও মানসিক দক্ষতাগুলো বিশেষত বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শেখানো যায় কি না এবং দ্বিতীয়ত, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যদি শেখানো যায়, তাহলে কোন বয়সে শেখানো হলে উৎকৃষ্টতা এবং উৎপাদনশীলতা তুঙ্গে থাকবে। অর্থাৎ শিশুদের কোন বয়সটি শেখার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বয়স এবং কখন শেখালে তারা বেশি শিখতে পারে–এগুলোই ছিল তাঁদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

দুই.

বলা বাহুল্য, জীবন-জীবিকায় অনেকগুলো সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা জরুরি হয়ে পড়ে, তবে গবেষকরা তাঁদের গবেষণায় আপাতত তিনটি মৌলিক দক্ষতা নিয়ে গ্রামীণ বাংলাদেশে গবেষণাটি করেছেন।

এই গবেষণায় যে তিনটি দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে মোটাদাগে সামাজিক-আবেগপ্রবণ দক্ষতা; যেমন–ক. ধৈর্য (সবুরে মেওয়া ফলে) যার মানে আজ একটি আইসক্রিমের লোভ কোনোমতে সামলাতে পারলে কাল দুটি খেতে পারব, খ. আত্মসংযম (স্বনিয়ন্ত্রণ সৌভাগ্যের সোপান) ও গ. পরার্থপরতা (আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে)। এই তিনটি দক্ষতার সঙ্গে সংযোগ আছে জীবনভর ফলাফলের যেমন শিক্ষাগত অর্জন, শ্রমবাজারে সাফল্য, স্বাস্থ্য, আর্থিক কল্যাণ এবং জীবন-তৃপ্তি। অথচ এরা কখন ঘটে সেটি

আমরা কমই জানি। মোটকথা এবং

মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন, মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই তিন মৌলিক দক্ষতা বাড়ানো যায় কি না, গেলে কখন, কিভাবে সেগুলো বাড়ানো যেতে পারে সেদিকে ছিল তাঁদের দৃষ্টি। প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ বলে যে যাদের আত্মসংযম নেই, তাদের ক্ষেত্রে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বেশি।

অন্যদিকে যেসব শিশুর ধৈর্য কম, তারা পরীক্ষায় ভালো ফল করে না। ফলে শিক্ষাদীক্ষায় বেশি দূর এগোতে পারে না। সুতরাং ‘জীবন করতে পরিপাটি ধৈর্য হচ্ছে চাবিকাঠি’ বললেও বোধ হয় ভুল হবে না।

পরার্থপরতার বিষয়টি একটু আলাদা ব্যাখ্যার দাবি রাখে এই অর্থে যে আমরা এমন একটি সমাজ দেখতে চাই, যেখানে ‘সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে’ অর্থাৎ একজন আরেকজনকে সাহায্য করবে। সমবায়ী মনোভাব পোষণ করা, হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেন দলবদ্ধ কাজ হয়, জনকল্যাণমূলক কাজের আধিক্যসমেত সমাজ সবার কাম্য। আর এগুলোর জন্য যে পরার্থপরতার মতো মনোভাবের বিকাশ অত্যন্ত জরুরি, তা

বোধ করি বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। কবি বলেছেন, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে’, কিন্তু আগে তো ডাকটা দিতে হবে।

তিন.

আমাদের শিশুরা কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসব দক্ষতার দীক্ষায় দীক্ষিত হচ্ছে? বিষয়টি দুইভাবে চিন্তা করছেন শ্যামল চৌধুরী ও তাঁর সহগবেষকরা। এর একটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কারিকুলামে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না এবং অন্যটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলেও শিক্ষকরা তা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে সক্ষম কি না। তাঁরা মনে করেন, মোটাদাগে কারিকুলামে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ কারণে তাঁরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কনটেন্ট নিয়ে এসেছিলেন, যেটি যুক্তরাষ্ট্রসহ শতাধিক দেশের কারিকুলামে রয়েছে। শিশুর সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা অর্জন ও বিকাশে এই গুণগুলোর পাঠ প্রায় সব দেশের শিক্ষাক্রমেই রয়েছে। বলা চলে, এটি একটি বিশ্বস্বীকৃত পাঠদান পদ্ধতি। দ্বিতীয় বিবেচনার বিষয় হলো শিক্ষকরা এ জন্য প্রস্তুত কি না। না, তাঁরা মোটেও প্রস্তুত নন। তবে শিক্ষকদের তাঁরা তিন দিনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, যা প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা খুব ভালোভাবেই রপ্ত করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আসলে উল্লিখিত দক্ষতার মন্ত্র শিশুদের মগজে দেওয়ার নিমিত্তে শিক্ষকদের প্রস্তুত করা তেমন একটা কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। বস্তুত মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বলে, যেসব স্কুলে সামাজিক ও মানসিক দক্ষতার বিষয়টি পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, সেসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলায় বা গণিতে আরো বেশি ভালো করেছে। সেদিক থেকে চিন্তা করলে শিক্ষকদের দক্ষতার ঘাটতি ছিল না বললেই চলে।

চার.

গবেষকদের ধারণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়টির অনেকগুলো ধাপ রয়েছে। বিভিন্ন দক্ষতা বিভিন্ন ধাপে এবং বিভিন্ন বয়সে শেখা যায়। যেমন–যদি আইকিউয়ের কথা বলা হয়, আইকিউ শেখার সবচেয়ে ভালো বয়স হচ্ছে শূন্য থেকে ৩৬ মাস অর্থাৎ শিশুর প্রথম তিন বছরের মধ্যে তার আইকিউয়ের বিস্তর বিকাশ ঘটে যখন শিশুরা মা-বাবার সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে থাকে। সে ক্ষেত্রে মা-বাবার বাইরে সরকারের তো তেমন কিছু করার সুযোগ নেই। এই গবেষণার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের পড়িয়েছেন। তাঁরা দেখার প্রয়াস নিয়েছেন কোন বয়সের বা কোন শ্রেণির শিশুদের মধ্যে এই সামাজিক ও মানসিক দক্ষতার গুণগুলো কী পরিমাণে কার্যকর বিকাশ

ঘটতে পেরেছে। দেখা গেছে যে পঞ্চম শ্রেণির তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুরা ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ দক্ষতা দ্রুত শিখেছে। তাই তাঁরা কোমলমতি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়টিকে সংবেদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

পাঁচ.

এবার পদ্ধতিসংক্রান্ত দু-একটি কথা না বললেই নয়। দক্ষতা অর্জনের সংবেদনশীল সময় (সেনসিটিভ পিরিয়ড) নির্ধারণে গবেষকরা অভিনব আরসিটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, ইংরেজিতে বলে রেনডোমনাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল। এই পদ্ধতিতে একদলকে বিভিন্ন হস্তক্ষেপ/কর্মসূচির মাধ্যমে নিরীক্ষায় রাখা হয় (ট্রিটমেন্ট গ্রুপ) অথচ একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অন্য এক দলকে হস্তক্ষেপের বাইরে রাখা হয় (কন্ট্রোল গ্রুপ)। সময়ের আবর্তনে এই দুই গ্রুপের কৃতিত্বজনিত তফাত হলো কার্যকারণ বা কর্মসূচির প্রভাব।

আর এই কাজটি করতে গিয়ে তাঁরা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ১৫০টি গ্রাম (১৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬৯টি কর্মসূচির আওতায়) দৈবনমুনায় নির্বাচিত করেছেন; প্রতিটি স্কুলের ২-৫ গ্রেডের পাঁচজন ছাত্র এবং পরিবার, তা-ও দৈবনমুনায় নিয়েছেন পর্যবেক্ষণের জন্য। সব মিলিয়ে নমুনা আকৃতি তিন হাজার ২২২ জন। তাঁরা দেখতে চেয়েছেন শিশুদের কোন বয়সে কোন দক্ষতা প্রস্ফুটিত হয় এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে এটি জানা জরুরি। সামগ্রিক চিন্তায়, এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং পরার্থতা তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে ধৈর্যের ব্যাপারে তেমন কিছু হয়নি। আবার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যের বেলায় অপেক্ষাকৃত কম বয়সী শিশুদের ওপর হস্তক্ষেপের প্রভাব বেশি এবং গ্রেড ২-৫ পড়ুয়াদের ওপর পরার্থতা বিষয়ক প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

‘শৈশবে সময় পছন্দ ও সামাজিকমুখী সংবেদনশীল সময় নির্ধারণে দুর্লভ নিমিত্তবাচক পর্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা অবদান রেখেছি। ফলাফলে দেখা যায়, যদিও তিন বছর পার হওয়ার পর শিশুর কগনিটিভ স্কিলের ক্ষেত্রে করা বিনিয়োগে প্রাপ্তি কম, তার পরও সামাজিক-আবেগপূর্ণ বিনিয়োগে প্রাপ্তি বেশি হতে পারে...। আমাদের গবেষণার ফলাফল তাৎপর্য বহন করে এই অর্থে যে নীতিমালা প্রণয়নে এরা প্রাসঙ্গিক, বিশেষত পূর্বের অধ্যয়নগুলোতে পাওয়া যত আগে তত ভাগে (দি সুনার, দি বেটার) প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে। একই বিনিয়োগ বিভিন্ন বয়স বা গ্রেডে ভিন্ন ফল দিতে পারে...। সর্বোপরি যেহেতু আমরা শিশুদের সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেছি, যদি এই বিষয়টিকে শ্রেণিকক্ষে পাঠের আওতায় আনা যায়, তবে আমি মনে করি, তা শিশুদের ভবিষ্যেক আরো সুন্দর করতে সহায়ক হবে।’

লালনের কথায়–সময় গেলে সাধন হবে না।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়